



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 287 - 292

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

মিথ ও পুরাণের ভাঙ্গা-গড়া : ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’

অন্তরা গোস্বামী

গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

এবং

স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমান, কলকাতা

Email ID : antaragoswami77@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Myth, Hansuli
Bank, Tradition,
Reconstruction,
Babathakur,
Supernaturalism,
Modernity, tale,
Reality, Symbol.

Abstract

From the earliest time of civilization, people have very much adopted to the reforms and beliefs of the ancestors. Religion and division are associated with this belief. This belief and reform are seen in many literature. In Bengali literature, Tarashankar Bandopadhyay wrote a number of novels to make this myth alive. The myth has been uncovered since the beginning of this novel. The story begins with the focus of an unknown whistle. However, the Karali wants to free the entire neighbourhood from the myth's cover, by discovering the true cause of the sound. In this novel, myth- centric superstition can be noticed between the Banwari and Suchand and the openness of modern thought can be notice in the Karali. The protagonist has fought against many myths of Bashbadi from the very beginning. Sometimes the reason of the sound was due to a Russell's viper snake being burned, at times when he was in a dispute with his neighborhood for making a pakka house and when he chose a new life in Chandanpur. Not only did he chose himself a better life, but during the war, all the people of Bashbadi village were dragged to Chandanpur for giving them a better life. However, the path of the Karali was not smooth. Banwari and Suchand had always tried to promote the greatness of 'Kartababa' of Hansuli Bank. The conflict of veteran and newcomer is the core concept of this novel and the reality of the myth and mythology has gained prominence in the story. However, the author has cut off the old myth very nicely and implemented the latest myth.

Discussion

সভ্যতা সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ জগতের অপার রহস্যের কাল্পনিক ব্যাখ্যার পথ খুঁজতে থাকত। আর সেই রহস্যের সমাধানের কারণে জন্মলাভ করল ম্যানা, ম্যাজিক, টোটেম, ট্যাবু ইত্যাদি। প্রকৃতির নানা ঘটনার পিছনে সর্বশক্তিমানের অস্তিত্ব এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষেরা মানতে শুরু করল। তৈরি হতে লাগল নানা বিশ্বাস ও সংস্কার। এই সময়

থেকেই তাদের মধ্যে মিথের সৃষ্টি হতে থাকে। আসলে মিথ হল সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে চলে আসা কিছু কাহিনী, যা সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়ে প্রচলিত হয়। গোষ্ঠীর কাছে মিথের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর।

“A tribes mythology is its living religion, whose loss is always and every where, ...a moral catastrophe.”^১

মিথের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘মজ্জায় মিশে থাকা পিতামহের কাহিনী’। সত্যিই মিথ হল পুরাকালের অলৌকিক কাহিনী। সমাজ তাত্ত্বিক মির্চা এলিয়েদ একেই আবার বলেছেন ‘মিথোম্যানিয়া’। ‘মিথ’ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি শব্দ মনে আসে সেটি হল, পুরাণ। ভারতীয় সাহিত্যে পুরাণের নির্দিষ্ট ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণ ও ইতিহাস সমার্থক। যদিও পরবর্তীতে এই মত পরিবর্তিত হয়েছে।

“ইতিহাস, আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজ বিধি, দেব মাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সমন্বিত করে যে মিশ্ররূপসম্পন্ন গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তাদেরকে পুরাণ বলা হয়।”^২

পুরাণ সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি তৈরি করতে সহায়তা করে। বাংলা সাহিত্যে অন্যতম লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন সাহিত্যিক যিনি, প্রতিষ্ঠিত পুরাণ বৃত্তান্তকে মূল না ধরে মিথীয় পরিমণ্ডলে আপনার কল্পনার সংযোগ ঘটিয়ে নতুন বেশ কিছু মিথ কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ অন্যতম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক শিল্পী যার রচনায় সৃজনশীল লোকপুরাণ (creative myth) প্রাধান্য লাভ করল। আসলে সৃজনশীল বর্ণনাকারী হল তারাই যারা, সকলের জানা ঘটনার সঙ্গে নিজের ভাবনার সংযোগ ঘটিয়ে নতুন করে লোকপুরাণ তৈরি করে। এমনই একজন শিল্পী হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই স্বকীয়তার জন্যই অন্যান্য রচয়িতাদের থেকে তিনি যেন আলাদা মাত্রা লাভ করলেন। তবে ইতিহাস আশ্রিত সৃজনশীল মিথের সঙ্গে নতুন ভাবনার সংযোগ ঘটানো অত সহজ কাজ নয়, কারণ লেখককে প্রতিনিয়ত সচেতন থাকতে হয় কখনোই সেটা প্রক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন মনে হচ্ছে কিনা। তাই সংযোজিত ভাবনাকে অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য করে প্রকাশ করা এই জাতীয় লেখকদের একটি কঠিন কাজ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ এবং ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ এই দুটি উপন্যাস ছাড়াও ‘ডাইনি’, ‘ডাইনির বাঁশি’, ‘শবরী’, ‘কামধেনু’, ‘নারী ও নাগিনী’, ‘বেদেনী’ ইত্যাদি নানা ছোটগল্পেও এই মিথের অল্প বিস্তর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে রাঢ় বাংলার অঞ্চলটি বেছে নিয়েছিলেন, যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুবই উজ্জ্বল। বলা যায় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। তাই লেখক এই উপন্যাসে মিথের বিস্তারকে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা বর্তমানে বসবাস করলেও তাদের মানসিক অবস্থান সেই আদিম কালের আলো আঁধারি মিথলগ্ন জীবনে। তাই তো তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কত্তাবাবা (বাবাঠাকুর) নিয়ন্ত্রিত। কাহার পাড়ার প্রত্যেকে বিশ্বাস করে কর্তাবাবা বেল গাছে রয়েছেন। এমনকি বাঁশবাদি গ্রাম থেকে সাহেবদের বার করে দিয়ে তিনিই নাকি কাহারদের পাড়াকে বাসযোগ্য করে দিয়েছেন। এইসব অলৌকিক দৈব অস্তিত্বের কল্পনার মাধ্যমে বহু বিচিত্র পুরাণবৃত্ত রচিত হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায় এই উপন্যাসেরই অন্যতম চরিত্র করালী, তার স্ত্রী পাখি ও তাদের কয়েকজন সঙ্গী সাথীদের। তবে এই উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্বই হল মিথের প্রাচীন সীমাবদ্ধতা এবং আধুনিকতার উদারতা।

এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু হয়েছে ‘অলৌকিক’ শিশু ধর্মির মাধ্যমে। কাহাররা মনে করে এই ধর্মি আসলে কোন অশুভ ইঙ্গিতকে নির্দেশ করছে, কিন্তু আধুনিকমনস্ক করালীর কাছে অলৌকিকতা হার মানে। করালীর পোষ্য কালুয়া যখন শিশু ধর্মির উৎস সন্ধান গিয়ে ফিরে আসে, তখন তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে মারা যায়। প্রাচীন মিথ মনস্ক সমর্থনকারী ব্যক্তির জ্ঞান, বাবাঠাকুর বোধ হয় পা দিয়ে চেপে মেরে ফেলেছে। কিন্তু করালী এর ব্যাখ্যা মানতে পারে না। করালী চন্দ্রবোড়া সাপকে আবিষ্কার করার পর পুড়িয়ে মারে। গল্পমুখ মিথের জগত থেকে বাস্তবতার অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। বলা যায় করালী গল্পের সূচনা থেকেই মিথের আবরণকে ধ্বংস করে বাস্তব সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তবে সুচাঁদ চেষ্টা করে চলে মিথের মায়াবী জগতের বিস্তারের। তাই তো হঠাৎ সুচাঁদের বিলাপে শোনা যায় -

“ও যে আমার বাবা ঠাকুরের বাহন রে। ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে ‘ভোমন’ করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি রে।”^৩

এই ঘটনার পরেই কাহিনির গতি পুনরায় মিথমুখী হয়ে ওঠে। পাড়ায় প্রবীণেরা করালীর কার্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কর্তাবাবার থানে পূজা করে, যা মিথধর্মীতাকে তুলে ধরে।

এর পরবর্তী অংশে দেখা যায় মিথ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে এবং প্রাধান্য পেয়েছে মিথের আবর্ত। এখানেই বনওয়ারী, করালী আর পাখির বিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে আনে। বনওয়ারী আধুনিকমনস্ক বাস্তবতার অস্তিত্বকে কিছুটা হলেও স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই তো প্রবল বৃষ্টিতে জ্বাল দেওয়া গুড় বাঁচাতে ত্রিপল ব্যবহার করেছে। এমনকি ‘হাতে গাঁইতি’ ধরে পাথুরে মাটি কেটেছে, যা সংস্কারকে অমান্য করে। কিন্তু কালোশশীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পাপবোধ পুনরায় তাঁর সংস্কারের সীমাবদ্ধতাকে জাগ্রত করেছে। এর সমাধান সুত্র হিসাবে বনওয়ারী গাজনের পাটায় ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে মিথের পথে কাহিনি পুনরায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে শুরু করে।

আসলে কাহারদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নানারকম কিংবদন্তী ঘিরে থাকে। সেই কারণেই কর্তাবাবার অস্তিত্ব সর্বত্র লক্ষিত হয়। এই বাবাঠাকুর কাহারদের উপাস্য দেবতা। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ধবধবে পৈতে এবং পায়ে খড়ম। দেবতার এ জাতীয় সাজ দেখে ব্রাহ্মণদের প্রতীক বলে মনে হয়। আসলে -

“অন্ত্যজ কাহারেরা ব্রাহ্মণ অপদেবতা ব্রহ্মদত্যিকে উপদেবতা জ্ঞানে পূজা করে। ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চবর্ণের প্রতি তাদের মনে কোন বিদ্বেষ নেই। বরং উচ্চকুলে জন্ম তাদের মনোগত বাসনা।”^৪

এই বাসনা থেকেই তাদের বাণ রাজার মিথ প্রচলিত হয়ে যায়। মিথে আছে রাজা বাণ গৌঁসাই অন্ত্যজ হলেও ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। তাঁর ওপর মহাদেব ছিলেন অত্যন্ত সন্তুষ্ট। এই গৌঁসাই এর একমাত্র কন্যা ছিলেন ‘উষামতি’ (রুসামতি), যার প্রেমে পরেন নারায়ণের নাতি অনিরুদ্ধ। তিনি একদিন গোপনে প্রবেশ করেন উষার ঘরে। এই ঘটনায় বাণ গৌঁসাই অত্যন্ত রেগে যান। অন্যদিকে পৌত্র স্নেহে অন্ধ নারায়ণ বাণ রাজার হাত-পা কেটে ফেলেন। শেষে শিবের উপস্থিতিতে উষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়ে যায় এবং বাণ গৌঁসাই বর চান কালরুদ্ধের সাথে যেন তাঁর পূজা হয়। তখন থেকেই কাহার সম্প্রদায় তাঁর পূজা করে আসছে। অনেক সমালোচক মনে করেন শিবই হলেন কালরুদ্ধ। এই কাহিনিতে লেখক যেন এই কাহার সম্প্রদায়কে একটি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এইভাবে লেখক কাহিনি বয়নে মিথের সুনিপুণ সংযোজন করেছেন।

উপন্যাসের পরবর্তী পর্বে মিথের প্রভাবে বাস্তবতা অনেকটা অবদমিত হয়েছে। এই অংশে বনওয়ারী গাজনের পাটায় উঠেও অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে প্রমাণ করে সে অন্যায় করে নি। এদিকে প্রবল ঝড়ের প্রভাবে করালীর ঘরটি ভেঙে পড়ে। কাহার পাড়ার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কর্তাবাবার কোপেই ‘পাপী’ করালীর এই পরিণতি। কিন্তু বাস্তববাদী করালী মনস্ত্বির করে কোঠাবাড়ি বানাবে বলে। তার এই প্রতিবাদ শুধু প্রকৃতির বিরুদ্ধেই নয়, কাহার পাড়ার প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এতে কাহার পাড়ার মিথধর্মীতার প্রভাব সামান্য প্রতিহত হলেও মিথের বিস্তার লক্ষ্যণীয়।

কিন্তু এরপরেই হাঁসুলী বাঁকের কাহিনি বাস্তবতার পথে চলতে শুরু করে। যে করালী ভেবেছিল পাকা বাড়ি তৈরি করবে সত্যি সত্যি সে পাকা বাড়ি তৈরি করতে উদ্যোগী হয়। করালীর যুক্তির কাছে জমিদার চৌধুরীও হার মানে। কাহার পাড়ায় শোরগোল পড়ে গেলেও তারা করালীর যুক্তিকে চিন্তা করতে শুরু করে। তবে এই সময় বনওয়ারী কথিত ‘বাবাঠাকুরের’ আইনের কারণে কাহার পাড়ার সকলে এসে করালীর ঘর গুঁড়িয়ে দেয়। গ্রামের লোকের এ জাতীয় আচরণে করালী স্ত্রী পাখীকে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করে চন্দনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কাহারপাড়ার মানুষেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে কর্তাবাবার কোপেই করালী গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এখানেই সমাজ বাস্তবতার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু না কাহিনি ধীরে ধীরে মিথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। করালী কাহারদের মনে আধুনিকতার বীজবপন করে দেয়।

করালী এরপরেই আদিম সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ঘোষণা করে এবং ‘কোম্পানী’র আইন অনুযায়ী বনওয়ারীর বিরুদ্ধে নালিশ করে পুলিশের কাছে। পুলিশও জমিস্বত্ব বিধি অনুযায়ী নির্বিঘ্নে করালীর বাড়ি তৈরির কথা বনওয়ারীকে

জানায়। ফলে আদিম বিশ্বাস প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সময়ই ঘটে যায় আর একটি ঘটনা। সাপের কামড়ে মারা যায় ‘নিমতেলে’ পানুর ছেলে। পানু কিন্তু করালীর মত বিদ্রোহী নয় তবুও তাঁর এই পরিণতিতে কাহার পাড়া হতবাক হয়ে যায়। যুক্তিবাদের প্রতি কাহারদের মন আসক্ত হতে থাকলেও মিথের গভীর প্রভাব তাদের চিন্তাকে অন্য পথে চালিত করে। তারা গল্প সাজায় পানু ‘খুঁতো’ পাঁঠা বলি দেওয়ার কারণেই নাকি তার এই অবস্থা। এখানেও করালী প্রাচীন চিন্তাকে ভাঙতে উদ্যত হয় এবং জানায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে ছেলেটিকে হয়তো বাঁচানো যেত।

এরপরেই হাঁসুলী বাঁকের কাহিনি নতুন বাঁক নেয়। পাঠক মনকে লেখক মিথের জগত থেকে ভয়ঙ্কর বাস্তবতার জগতে টেনে আনেন। কাহিনিতে যুদ্ধের সমকাল প্রাধান্য পায়। ‘কালারুদ্রতলায়’ যুদ্ধের তাঁবু পড়ে। এই যুদ্ধ কাহারদের কল্পলোককে প্রবল আঘাত করে। অলৌকিকতা ও অবাস্তবতার মিথের জগত থেকে কাহাররা বাস্তবতার কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই পর্বেই প্রবল হয়ে ওঠে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব। বাঁশবাদি গ্রামে করালী প্রথম থেকেই আধুনিক চিন্তায় সব ঘটনাকে বিচার করছিল, এইবার কাহারদের মধ্যেও আধুনিকতার প্রভাব পড়তে শুরু হল। কিন্তু প্রবল ঝড়ে বাবাঠাকুরের বেলগাছ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা কাহারদের পুনরায় আতঙ্কিত করে তোলে। আসলে লেখক এই উপন্যাসে বেল গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনাটি যেন প্রতীকী হিসাবে তুলে ধরতে চাইলেন। তিনি যেন পাঠকদের ইঙ্গিত দিলেন

“আধুনিক জীবনের ক্রম-অগ্রগতি মানুষের মন থেকে অলৌকিক বিশ্বাসকে সমূলে উপড়ে নেয়, এই বেলগাছটি উপড়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাঁশবাদিগ্রামের বুক থেকেও যেন মিথের অলঙ্ঘ্য শিকড়টাই উৎপাটিত হয়ে গেল।”^৫

আসলে কাহারপাড়ার ‘মিথোম্যানিয়ার’ প্রতীক ছিল বাবাঠাকুরের ঐ বেলগাছ। শুধু বেলগাছ ভেঙে পড়াই নয়, প্রবল বন্যায় কাহার পাড়ার মানুষ, প্রানী, গাছ-গাছালি, কুঠিবাড়ি সব ভেসে যায়। লেখক উল্লেখ করলেন -

“কাহারদের পিথিমি অন্ধকার হয়ে গেল।”^৬

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও যেন ‘যুগক্রান্তির’ সূচনা করেছে বলা যায়। আসলে লেখক এই জাতীয় প্রতীকীর প্রয়োগের মাধ্যমে আদিম ধ্যানধারণার বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে আধুনিক মনস্কতার আগমনকে নিশ্চিত করলেন।

আর সেই কারণেই উপন্যাসের শেষপর্বে যুদ্ধের ভয়াল গ্রাসে বাঁশবাদি গ্রামের সমস্ত অলৌকিকতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। লেখক লিখলেন, -

“যুদ্ধ এবার কালারুদ্রের শাসন ভেঙে বাঁশবাদিতে ঢুকল।”^৭

এমনকি গ্রামের বাঁশবাড়ি পরিষ্কার করে যুদ্ধের তাঁবু পড়তে লাগল। একটু অন্যভাবে বলা যায় হাঁসুলী বাঁকের মিথের আচ্ছন্নতা ক্রমে দূর হতে থাকে। কাহারেরা আর অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে পারে না। যেমন -

“মাটির তলার পাথর হল অসুরের হাড় (‘অসুরের কাঁড়ি’); তারা গাঁয়ের দক্ষিণে থাকে বলে বিপদ-মড়ক এলে তাদেরই আগে মরতে হবে; বাবা কালারুদ্র ত্রিশূলের খোঁচায় ‘ম্যাঘ’ উড়িয়ে দেন... দমকা বাতাস হয়ে প্রেতাঝারা ঘরে ফেরে (‘বাওড়’) ...বাবার ক্রোধের কারণেই আকাশের উড়োজাহাজও মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল; মা বসুমতী ‘অজ্ঞ’ নিয়েছেন যখন, তখন ফসলও দেবেন ‘লিশ্চয়’!”^৮ ইত্যাদি।

করালী এই উপন্যাসে নতুন যুগের বাহক। করালীর কারণেই যন্ত্রসভ্যতার করাল ছায়া ধীরে ধীরে গ্রাস করল বাঁশবাদি গ্রামকে। পাশাপাশি যুদ্ধ করালীকে আরও যেন সাহস যুগিয়েছে। তাই বাবাঠাকুরের থান ভেঙে যখন যুদ্ধের গ্যারেজ তৈরি হয়, তখন কাহারেরা আর গ্রামে থাকতে চায় না। গ্রামের সবাই আধুনিক নাগরিক জীবনের আকাঙ্ক্ষায় চন্দনপুরের কারখানায় নগদ মজুরীর বিনিময়ে কাজে যোগ দেয়। এখন তারা একদম আলাদা মানুষ। লেখক লিখলেন -

“পোষাকে কথায় বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে... চন্দনপুরের কারখানায় খেটেও তারা না - খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা পড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকে না।”^৯

এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় মিথময় অতীতটা কাহারদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে।

কিন্তু প্রাচীন প্রথা আর কুসংস্কারের প্রতীক বনওয়ারী শেষ পর্যন্ত জীবনের কাছে হেরে গিয়ে শয্যা নেয়। তার নিজের বলে আর কেউ থাকল না। কাহারেরা যখন নগরজীবনের হাতছানিতে গ্রাম ত্যাগ করতে থাকে তখন পাগল ও নসুবালাই শুধু গ্রামে থেকে যায়। তাদের কাছে বাঁশবাদি বড্ড আপন। নসুবালার মায়ের স্তন্যপান করে করালী মানুষ হয়েছে। ভাই বোনের সম্পর্কের কারণে নসুবালা করালীকে সবসময় সাহায্য করত। কিন্তু পাখিকে ছেড়ে করালী সুবাসীকে সাঙা করায় সে করালীকে ত্যাগ করে এবং বনওয়ারীর দলে যুক্ত হয়। এমনকি পাগল গান বাঁধে, নসু নাচে। দুজনেই অসুস্থ বনওয়ারীকে সেবা করে। তারা বনওয়ারীকে সেবার মাধ্যমে যেন মিথের জগতের অস্তিত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। তাই তো পাগল গান গায় –

“জাতি যায়, ধরম যায় মেলোছো কারখানা

ও পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।”^{১০}

শুধু পাগল আর নসুবালাই নয় এই কাহিনির সুচাঁদ পিসিও যেন উপকথার জগতের বাসিন্দা। আবার বনওয়ারী সুচাঁদের আত্মীয়। সুচাঁদ পিসি হল আদিকালের বুড়ি। হাঁসুলী বাঁকের আবহমানকালের ভাষ্যকার এই সুচাঁদ। সে কাহারদের গল্প শোনায় এবং তার মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। সুচাঁদের উপকথার এক সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে। হাঁসুলী বাঁকের কাহিনির শেষ পর্বে মিথের জগতের প্রভাব যখন কমতে শুরু করে তখন তার পরিণতি করণ হয়ে ওঠে। সুচাঁদের ‘হিয়ার জিনিস’ উপকথা চন্দনপুরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে বলতে শুরু করে। সে স্বীকার করে নেয় তার সাথেই উপকথার শেষ। তার শেষ কথা –

“আঃ- হাঁসুলী বাঁকও শেষ- আমিও শেষ, কথাও শেষ। আঃ- আঃ।”^{১১}

কিন্তু লেখক তারাক্ষর এখানেই কাহিনির শেষ করলেন না। তাঁর এই উপন্যাসে চিত্রিত হল সভ্যতার বিবর্তনের জীবন্ত চিত্র। এই উপন্যাসের সূচনাতে যেখানে দেখানো হয়েছে কাহারপাড়ার আদি পেশা ছিল পালকি বহন করা, সাহেবদের কুঠিরের পালকি তারা বয়ে নিয়ে যেত, এরপর সাহেবদের অবস্থা, জমিদারের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে কাহারপাড়া পেশাহীন হতে থাকে। অতীত পেশা থেকে বেরিয়ে তারা চাষী হিসেবে নিজেদের নিযুক্ত হতে লাগলো। ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে চলল কিন্তু শিকড় থেকে তাদের বিচ্যুতি ঘটে গেল। বনওয়ারী, পরম তারা জমি চাষ করতে লাগলো এবং করালী পরিণত হল কারখানার শ্রমিকে। এইভাবে কাহারপাড়া আধুনিক হতে শুরু করল। যদিও হারিয়ে যেতে লাগল প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড়। লেখক কিন্তু হতাশ হলেন না, বরঞ্চ নতুন আশার মাধ্যমে কাহিনিকে পুনরায় গড়ে তুললেন। করালীকে তিনি কালচার হিরো হিসাবে পাঠকের সামনে নিয়ে এলেন। এমনকি নসুবালার মাধ্যমে পাঠক পেল নতুন খবর যে, বাঁশবাঁদির বাঁশের বেড়া ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। করালী শক্ত হাতে মাটি খুঁড়ছে কারণ এইবার সে নতুন ঘর তুলবে। তখন সুচাঁদ দু-হাত তুলে সানন্দে বলে ওঠে –

“আবার নতুন বাঁশের বেড়া উঠবে।”^{১২}

অর্থাৎ পুরাতন মিথের সমাপ্তি ঘটিয়ে মিথকে রি-কনস্ট্রাক্ট করবে করালী। এই ইতিবাচক ধারণা নিয়েই প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্ব এবং মিথ-পুরাণের ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে নতুন মিথের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তারাক্ষর নিজে তার ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে।

Reference:

1. Jung; C.G, The Collective Unconscious And Archetypes, The Modern Traditions, Ed. by Elmann, OUP, Newyork, 1965, p. 642
2. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙ্গাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ. ১৯
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাক্ষর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই, ২০১২, পৃ. ৩৬
4. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৯৮
5. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙ্গাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০১৫, পৃ. ১৪০

-
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৫৭
৭. তদেব, পৃ. ২৫৯
৮. সেনগুপ্ত, পল্লব, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : সাহিত্যিক নৃত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণে, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৮৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৮৪
১০. তদেব, পৃ. ১৪৭
১১. তদেব, পৃ. ২৮৫
১২. তদেব, পৃ. ২৮৫